গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা | ২০ - ২৬ মে ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

এসএসসি দুর্নীতিতে বঞ্চিত সব চাকরি-প্রার্থীকে নিয়োগ করতে হবে

স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-সি পদে নিয়োগে দুর্নীতির তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৪ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

গ্রুপ-সি পদে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ সম্পর্কে হাইকোর্ট নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৮১ জনের বেআইনি নিয়োগ প্রমাণিত হয়েছে, ২২২ জন লিখিত পরীক্ষায় পাশ না করায় মৌখিক পরীক্ষায় বসতে পারেননি এবং বাকিদের ক্ষেত্রেও নানা অনিয়ম আছে। অর্থাৎ কমিশন গ্রুপ-সি ও ডি এবং নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে চরম দুর্নীতি করেছে। এই দুর্নীতির সাথে কমিশনের তৎকালীন উপদেষ্টা এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি সহ আরও অনেক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের নাম জড়িয়ে আছে। এই ঘটনা প্রমাণ করল মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বললেও তৃণমূল পূর্বতন সরকারগুলির এমন দুর্নীতির ধারাবাহিকতায় অনেক ধাপ এগিয়ে গেছে।

আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। যাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে তা অবিলম্বে কার্যকর করার দাবি করছি। সব বেআইনি নিয়োগ বাতিল করে প্যানেলভুক্ত বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের দাবি করছি।

বিরোধিতা দমনে ‘দেশপ্রেমিক’ বিজেপির হাতিয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আইন

ভারতে ‘রাষ্ট্রদ্রোহ’ নামে যে আইনটি এখন চালু আছে তা ভারতীয়দের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দমন করার জন্য ব্রিটিশ শাসকরা তৈরি করেছিল। সেই আইন যা দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হওয়া দরকার ছিল, তা স্বাধীন ভারতের শাসকেরা ব্রিটিশ শাসকদের মতোই দেশবাসীর ক্ষোভ-বিক্ষোভ দমন করতে লাগাতার ব্যবহার করে এসেছে। বিজেপি শাসিত ভারতে এই দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা তথা ‘রাষ্ট্রদ্রোহ’ আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার এমনই বাড়াবাড়ির স্তরে পৌঁছেছে, যাতে মনে হবে বিজেপি দলটিই বুঝি রাষ্ট্র, এবং এই দলের নেতারা সব রাষ্ট্রের এক একজন স্তম্ভ। আর, দেশের নাগরিকরা সব বিজেপি নেতাদের প্রজা। নেতাদের অপকর্মের বিরোধিতাই রাজদ্রোহ। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের নানা স্তর থেকে বিজেপি সরকারের এই স্বৈরাচারী আচরণের বিরোধিতা শুরু হয়। বিরোধিতার পাশাপাশি নানা ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয় যাতে কোর্ট ব্রিটিশ শাসকদের তৈরি দমনমূলক এই আইনটি বাতিল করে স্বাধীন ভারতে নাগরিকদের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর শঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার ১৮৭০ সালে কুখ্যাত ‘সিডিশন’ বা রাজদ্রোহ আইন প্রণয়ন করে। যার বলে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আন্দোলন দূরে থাক এমনকি যে কোনও রকম সমালোচনা করার অধিকারও তারা কেড়ে নেয়। এই আইনের বলে কোনও রকম বক্তব্যে, লেখায় বা কাজে সরকারের প্রতি আনুগত্যহীনতা বা সরকার বিরোধিতা প্রকাশ পেলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তিন বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া চলে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই আইনকে নির্বিচারে প্রয়োগ করে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর যে নির্মম দমনপীড়ন চালায় তা আজ ইতিহাস। গান্ধীজি, নেতাজি, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রাই, ভগৎ সিংয়ের মতো সর্বভারতীয় স্তরের নেতা সহ একেবারে স্থানীয় স্তরের স্বদেশি বিপ্লবীদেরও ‘রাজদ্রোহ’ অজুহাতে

দুয়ের পাতায় দেখুন

এসএসসি দুর্নীতি। দোষীদের শাস্তি চাই

এসএসসি পাশ করা প্রার্থীদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের বেআইনি নিয়োগের প্রতিবাদে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এআইডিওয়াইও-র বিক্ষোভ। ১৪ মে

বিপন্ন অর্থনীতি, গণবিক্ষোভে উত্তাল শ্রীলঙ্কা

গণবিক্ষোভে উত্তাল শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কার যে শাসকরা সে দেশের সংখ্যালঘু তামিল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলি উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে ভোটে জিতে ক্ষমতা দখল করেছিল, তারাই এখন জনগণের বিক্ষোভের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজাপক্ষে, যিনি রাষ্ট্রপতির নিজের দাদা, তিনি পদত্যাগ করেই রেহাই পাননি, তাঁর প্রাসাদোপম বাড়িতেও বিক্ষোভ আছড়ে পড়ার ফলে নৌবাহিনীর ঘাঁটিতে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে। শাসক দলের এক এমপি জনরোষের সামনে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। সে দেশের মন্ত্রী এবং শাসক দলের নেতাদের হেনস্থার একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি সরকারের হয়ে গলা ফাটাতেন যে সাংবাদিকরা তাঁদেরও জনরোষের মুখে পড়তে হচ্ছে। পুরো মন্ত্রিসভা আগেই পদত্যাগ করেছে। দেশ জুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভের মধ্যে প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপক্ষে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রনিল বিক্রমসিংঘেকে নিযুক্ত করেছেন। যদিও খোদ প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিটাই এখন প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া সর্বদলীয় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তাব দিলেও তা কেউই গ্রহণ করেনি।

গত কয়েক মাস শ্রীলঙ্কা জুড়ে চলছে এক অভূতপূর্ব সংকট। মার্চ মাসের শেষ থেকে শুরু হয়েছে দিনে বারো তেরো ঘন্টার বেশি বিদ্যুৎ ছাঁটাই, কয়লা-পেট্রল-ডিজেল-কেরোসিন-রান্নার গ্যাস সহ সমস্ত জ্বালানির চরম অভাব। চলছে তীব্র খাদ্য সংকট। আর্থিক সংকটে একের পর এক কোম্পানি বন্ধ হয়ে অসংখ্য মানুষের কাজ চলে গেছে। মৎস্যজীবীরা তেলের অভাবে জলযান নিয়ে সমুদ্রে নামতে পারছেন না। স্থানীয়ভাবে কিছু শাকসবজি, মাছ ইত্যাদি উৎপাদন হলেও তা বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ির তেলও জোগাড় করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ফলে বহু জায়গায় মাছ, শাকসবজি পচে নষ্ট হচ্ছে। অথচ দেশে তার মূল্য বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। শিশুখাদ্যের তীব্র আকাল, ওষুধের ভয়াবহ অভাব দেখা দিয়েছে। এমনকি কাগজের অভাবে সমস্ত কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়াশোনা পর্যন্ত বন্ধ। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে অত্যাবশ্যক পণ্যবাহী জাহাজ বন্দরে নোঙর করে থাকলেও সরকারের টাকার অভাবে তা থেকে মাল খালাস করা যায়নি। শ্রীলঙ্কা সরকার নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে জানিয়েছে, কোনও বকেয়া বিদেশি ঋণ তারা শোধ করতে অপারগ।

তিনের পাতায় দেখুন

চটশিল্পের সঙ্কট কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত পাটনীতির জন্যই

বর্তমানে রাজ্যে ১৬টি জুট মিল কাঁচা পাটের অভাব দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

কেন কাঁচা পাটের অভাব? গত বছর কাঁচা পাটের ভাল উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও কেন পাটের অভাব? বর্তমানে চাষিদের হাতে পাট নেই, পাট বিক্রয়ের মাণ্ডিগুলিতেও পাট নেই। তাহলে কোথায় গেল পাট? সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন জুট কমিশন ৬৫ হাজার টাকা প্রতি টন কাঁচা পাটের সহায়ক মূল্য ধার্য করেছে। জুট কমিশন চালু হয়েছিল পাটচাষিদের ন্যায্য মূল্য দেওয়া, পাট কেনা এবং জুটমিলগুলিকে সরবরাহ করার জন্য। কিন্তু জেসিআই বর্তমানে এক ছটাকও পাট কেনে না এবং কাঁচা পাটের বাজারের উপর এর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে সহায়ক মূল্য ধার্য করাও এক অন্তঃসারশূন্য ঘোষণা। পাট বর্তমানে খোলাবাজারের পণ্য এবং এখানে অবাধে কালোবাজারি ও মজুতদারি চলছে। এই কালোবাজারি ও মজুতদারির কারণেই কাঁচা পাটের অভাব।

চারের পাতায় দেখুন

কংগ্রেসও কুখ্যাত রাষ্ট্রদ্রোহ আইন কাজে লাগিয়েছে

একের পাতার পর

বিনা বিচারে ইচ্ছামতো কারারুদ্ধ করেছে ব্রিটিশ সরকার। এমনকি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস, নজরুলের কবিতা, প্রেমচন্দের গল্প, মুকুন্দদাসের গানের মতো যে কোনও রচনা, সঙ্গীত, সাধারণ সভা সমিতির বক্তব্য সমস্ত কিছুকেই 'সিডিশাস' ছাপ মেরে নিষিদ্ধ করে দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট লেখক, শিল্পী, বক্তাদের কারারুদ্ধ করা ছিল ব্রিটিশ শাসনকালে নিত্যদিনের ঘটনা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি কিন্তু এই চূড়ান্ত স্বৈরাচারী আইনটিকে বাতিল করল না, নানা কথার ছলে আইনটিকে চালু রেখে দিল। কোর্টে আবেদনকারীদের বক্তব্য, এমন একটি আইন যা বিদেশি শাসকরা স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করার জন্য তৈরি করেছিল, স্বাধীন ভারতে সেই আইন চালু রাখা মানেই তা নাগরিক স্বাধীনতার পরিপন্থী। অবিলম্বে তা বাতিল করা হোক। আবেদনে এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে, স্বাধীন ভারতে যারা যখন শাসন ক্ষমতায় বসেছে তারা প্রত্যেকে আইনটি বিদেশি শাসকদের মতোই দেশের জনসাধারণ এবং বিরোধী দলগুলির বিরোধিতা-বিক্ষোভ স্তব্ধ করতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে চলেছে। বিজেপি শাসনে এর অপব্যবহার মাত্রাছাড়া আকার নিয়েছে।

এই অবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের মত জানতে চায়। উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রদ্রোহ আইনটি যেমন আছে তেমন অবস্থাতেই রাখার পক্ষে সওয়াল করে। বলে, আইনের অপব্যবহারের অভিযোগ কোনও ভাবেই সাংবিধানিক বেঞ্চের রায় পুনর্বিবেচনা করার যুক্তি হতে পারে না। আইনের অপব্যবহার রোখার উপায় হল, প্রতিটি অভিযোগকে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করা। যদিও কেন তাঁরা এই আইনের অপব্যবহার এতদিন রোখেননি, কেন প্রতিটি অভিযোগকে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করেননি, কেন অভিযুক্তরা বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে বন্দি থেকেছেন তার কোনও উত্তর দেননি। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে এক মামলার বিচার উপলক্ষে পাঁচজন বিচারকের সাংবিধানিক বেঞ্চ এই আইনটিকে বহাল রাখে। যদিও রায়ে বলা হয় একমাত্র হিংসায় উস্কানি কিংবা জনজীবনে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টার ক্ষেত্রেই এই আইনকে ব্যবহার করা যাবে, নিছক সরকারের সমালোচনা কখনও দেশদ্রোহ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

প্রথমে আইনটিকে আগের অবস্থাতেই বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করলেও পরে মোদি সরকারের মনে হয়, সুপ্রিম কোর্ট আইনটি বাতিলের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই সরকার তড়িঘড়ি আগের মত পাল্টে কোর্টকে জানায়, রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের কিছু অংশ পরীক্ষা ও পুনর্বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। উপযুক্ত ফোরামে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তার আগে যেন আদালত কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে। কিন্তু এই পর্যালোচনা কত দিনে শেষ হবে, কারা তা করবেন, ততদিন আইনটি কী অবস্থায় থাকবে, সবচেয়ে বড় কথা, সরকার এই আইন বাতিল করার লক্ষ্যেই এই পর্যালোচনা চায় কি না, এ সবের কোনও কিছুই সরকার জানায়নি। বিজেপি সরকারের যা চরিত্র এবং ইতিহাস তাতে স্বাভাবিক ভাবেই কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পর্যালোচনার ছলে বিষয়টিকে আপাতত ধামাচাপা দেওয়া এবং সুপ্রিম কোর্টের হাত থেকে নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়াই এই ঘোষণার উদ্দেশ্য। কিন্তু শাসক বিজেপির এই চাল ব্যর্থ হয়ে যায় যখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রমণার নেতৃত্বাধীন তিন জন বিচারপতির বেঞ্চ ঘোষণা করে যে, যত দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের পুনর্বিবেচনা না করছে তত দিন কেন্দ্র বা রাজ্য ওই আইনে এফআইআর দায়ের করবে না। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন তথা ১২৪এ ধারায় যে সব মামলা দায়ের হয়েছে সেগুলিরও তদন্ত বন্ধ থাকবে। কোনও গ্রেফতারি বা দমনমূলক পদক্ষেপ করা যাবে না। এই আইনে অভিযুক্তরা জামিনের আবেদন করতে পারবেন।

এ বার দেখা যাক, স্বাধীনতার পরেও রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের অপব্যবহার কেমন হারে ঘটে চলেছে এবং বিজেপি শাসনে তা কোন মাত্রায় পৌঁছেছে। বর্তমানে সারা দেশে ৮০০টিরও বেশি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় প্রায় ১৩ হাজার মানুষ জেলবন্দি। ন্যাশনাল ক্রাইমস রেকর্ড বুরো সহ বিভিন্ন সংস্থার তথ্য বলছে, ২০১০ সাল থেকে ১০,৯৩৮ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এঁদের প্রায় ৬৫ শতাংশের বিরুদ্ধে মামলা হয় ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে। রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে গত ছ'বছরে গ্রেফতার হয়েছে ৫৪৮ জন। কিন্তু মাত্র সাতটি মামলায় ধৃত ১২ জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৪৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী মোদির সমালোচনা করেছেন এবং ১৪৪ জন উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সমালোচনা করে অভিযুক্ত হয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করা ছাড়া এই আইন প্রয়োগের অন্য কোনও উদ্দেশ্যই নেই।

কি কেন্দ্রে, কি বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে যখন যে দল সরকারে থেকেছে সেই দলই বিরুদ্ধ কণ্ঠ রোধ করার জন্য এই আইন প্রয়োগ করে অপছন্দের লোককে 'সিডিশাস' ছাপ মেরে জেলে ভরে দিয়েছে। ১৯৭৩-এ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার ১২৪এ ধারা প্রয়োগ করে বিনা ওয়ারেন্টে বিরোধীদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তখন থেকে কংগ্রেস সরকার যতদিন কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল, বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রপন্থা প্রভৃতি দমনের অজুহাতে বহু ব্যক্তিকে এই আইনে গ্রেপ্তার করেছে এবং পরে টাডা, ইউএপিএ প্রভৃতি আরও বেশি দমনমূলক আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু ২০১৪তে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই 'সিডিশন' আইনের অপব্যবহার মাত্রাছাড়া হয়ে যায়।

১২৪এ ধারায় যেসব অভিযোগে মোদি সরকার সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করেছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেখলে চমকে উঠতে হয়। এটা একটা গণতান্ত্রিক দেশ না মধ্যযুগের রাজাবাদশাদের মুলুক, বোঝা যায় না। গত বছর আগ্রায় তিনজন কাশ্মীরি ছাত্রকে এই আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান জেতায় আনন্দ প্রকাশ করে সোসাল মিডিয়ায় পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে। ২০১৮ সালে মণিপুরের সাংবাদিক ওয়াংখেম সোসাল মিডিয়ায় নরেন্দ্র মোদি, আরএসএস এবং রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমালোচনা করেছিলেন বলে মণিপুর রাজ্যের বিজেপি সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে গ্রেপ্তার করে। একই ভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সমালোচনা করায় উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল আজিজ কুরেশিও অভিযুক্ত হয়েছেন। সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান হাথরসে এক মহিলার ধর্ষণ ও খুন করে জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনার সংবাদ করতে যাওয়ার পথেই গ্রেফতার করে দেশদ্রোহ আইনে জেলে ভরা হয়েছিল। এখনও তিনি জেলেই আছেন। তাঁর মতো আরও ১৩ জন সাংবাদিক এখন জেলে রয়েছেন। কংগ্রেস সরকারও পিছিয়ে নেই। ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকার এক প্রাক্তন পুলিশ অফিসারকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন, ইউএপিএ, আফস্পা সহ সমস্ত কালা কানুন প্রত্যাহারের দাবিতে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর বিক্ষোভ। ১৫ মে, কলকাতা

ব্রিটিশের তৈরি রাষ্ট্রদ্রোহ আইন চালু রাখতে তৎপর বিজেপি সরকার

ধিক্কার জানালো এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১০ মে এক বিবৃতিতে বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দমন করার জন্য ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার যে আইন এনেছিল, সেই রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত আইনকে (পেনাল কোডের ১২৪এ ধারা) যেভাবে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে সমর্থন জানিয়েছে তাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। স্বাধীনতার ৭৫ বছরের দীর্ঘ সময় ধরে দেশের মানুষ বারবার এই ভয়ঙ্কর আইন বাতিলের দাবি জানালেও কংগ্রেস, বিজেপি কিংবা অন্য কোনও শাসক কেউই তা করেনি। এই আইনে সরকারকে এমন নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা দেওয়া আছে যে, তারা যে কোনও বিরোধীকেই শত্রু গণ্য করে তাকে শাস্তি এমনকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে। রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয় স্তরেই সরকারগুলি এই আইনের অপব্যবহার করে চলেছে একটানা। অবশেষে এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে একগুচ্ছ পিটিশন দায়ের হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ আবেদনকারী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখিতভাবে মতামত জানাতে বললে কেন্দ্রীয় সরকার লিখিত বক্তব্যে জানায় কোনও আইনের অপব্যবহার তার পুনর্বিবেচনার কারণ হতে পারে না। সরকার আরও জানায়, এই আইন দীর্ঘ দিন ধরে অবস্থান করে তার জায়গা করে নিয়েছে এবং কালের বিচারে তা উত্তীর্ণ। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা আশঙ্কা করেছে সুপ্রিম কোর্ট হয়ত এই আইনকে বাতিল করে দিতে পারে। তাই সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, সরকার নিজেই এই আইনটিকে পুনর্বিচার ও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক। ততদিন পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট যেন ১২৪এ ধারা নিয়ে শুনানি না চালায়। আসলে সরকার সময় কিনতে চাইছে, যাতে এই মামলার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতে পারে।

সরকারের চালাকি এর থেকেই নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে। তারা একই সাথে সুপ্রিম কোর্ট এবং জনগণ উভয়কেই ধোঁকা দিতে চাইছে। যে কোনও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এমনকি সরকারের সঙ্গে সামান্য মতবিরোধকেও গলা টিপে মারতে একের পর এক কালা আইন সরকার আনছে। গণতন্ত্রের একেবারে ন্যূনতম শর্তকেও সরকার শেষ করে দিচ্ছে। আজ প্রয়োজন গণতান্ত্রিক চেতনা ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষ এমনকি বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের এগিয়ে আসা, যাতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বিজেপি সরকারের এই স্বৈরাচারী পদক্ষেপ রুখে দেওয়া যায় ও এই ভয়ঙ্কর আইন বাতিল করতে বাধ্য করা যায়।

বিপন্ন অর্থনীতি, গণবিক্ষোভে উত্তাল শ্রীলঙ্কা

একের পাতার পর

এমন পরিস্থিতি তৈরি হল কেন? কোভিডের আগে সে দেশে পর্যটন ব্যবসার রমরমা চলছিল। বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানি এই ব্যবসায় বিনিয়োগ করে বিপুল মুনাফাও করেছে। কোভিডে এই ব্যবসা মার খেয়েছে, সেটাকেই প্রধান কারণ বলে করপোরেট সংবাদমাধ্যম প্রচার করছে। কিন্তু এটাই সব নয়। ভারি শিল্প, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে দুর্বল শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে চা, কফি, রবার, মশলা বাগান একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ব্রিটিশ কলোনি থাকার সময় থেকেই। ১৯৪৮-এ স্বাধীনতার পর কিছু বছর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রভাব ও দেশে শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাবে শ্রীলঙ্কার সরকার জনগণকে কিছুটা রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তখন শ্রীলঙ্কা সরকার চা-কফি-রবার ইত্যাদির বাগান জাতীয়করণ করেছিল। ১৯৭৭-এর পর বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল হতেই শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির সেবাদাস হিসাবে তৎকালীন সরকার 'খোলা বাজার নীতি' নিয়ে আসে। বর্তমানে বাগিচা ফসল উৎপাদনের বড় অংশই বৃহৎ বিদেশি পুঁজি এবং তাদের দেশি অংশীদারদের দ্বারা পরিচালিত। চাষের জমির একটা বিরাট অংশ এই কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কাকে আমদানির উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। করোনা মহামারিজনিত লকডাউনের কারণে পর্যটন ব্যবসা মারাত্মকভাবে মার খেয়েছে। কৃষিজাত বাগিচা ফসলগুলির রপ্তানি থেকে আয় ক্রমাগত কমেছে। অথচ চড়া দামে খাদ্যশস্য এবং শিল্পদ্রব্য আমদানি তাদের করতেই হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে পেট্রোপণ্যের দাম বিপুলভাবে বাড়ায় সে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। ২ কোটি ২০ লক্ষের সামান্য বেশি জনসংখ্যাযুক্ত এই দেশের বিদেশি ঋণ ৩৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি (এক বিলিয়ন মানে ১০০ কোটি)। এই ঋণের অধিকাংশই জাপানের পুঁজি প্রভাবিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, মার্কিন প্রভাবাধীন আইএমএফ ও মূলত মার্কিন-ইউরোপিয়ান নানা লগ্নি বন্ডের থেকে নেওয়া। এছাড়াও আছে চিন ও ভারতের দেওয়া ঋণ। সংকটের জন্য শ্রীলঙ্কার টাকার (রুপি) মূল্য কমতে কমতে এক ডলার প্রায় ৩৪০ রুপিতে দাঁড়িয়েছে। বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ারও প্রায় শূন্য। এই যে বিপুল ঋণ সরকার নিয়েছে, তা কি সাধারণ মানুষের উপকারে লেগেছে? বিদেশি ঋণদাতাদের শর্ত মেনে সরকার অন্যান্য বুর্জোয়া দেশের মতোই বহুজাতিক কোম্পানিগুলির জন্য দেশের পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে পুরোপুরি খুলে দিয়েছে। ফলে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে অতিপ্রয়োজনীয় প্রকল্পে খরচের বদলে পর্যটনের উন্নতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা দৃঢ় করার অজুহাতে রাস্তা, ফ্লাইওভার তৈরির হিড়িক পড়ে গেছে। আজকের বিশ্বায়নের ফরমুলায় দেশে দেশে এটাকেই উন্নয়ন বলে চালানো হচ্ছে। শ্রীলঙ্কাও সেই বিশ্বায়নের ফাঁদে পড়েছে। এই বিপুল পরিকাঠামো উন্নয়ন খরচ এখন যোগ হয়েছে শ্রীলঙ্কার ঋণের সাথে। এছাড়া বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে শ্রীলঙ্কা সরকারও অর্থনীতির সামরিকীকরণ করতে চাইছে। সে জন্য বাজেটের ১০.৩ শতাংশ তারা সামরিক খাতে ব্যয় করছে। যা সমস্ত জনকল্যাণমুখী খরচের থেকে বহুগুণ বেশি। সামরিক বাজেট বৃদ্ধির প্রেক্ষাপট তৈরি করতে দেশের তামিলভাষী মানুষ, মুসলমান, খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে শত্রুর আসনে বসিয়ে তীব্র জাতিঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে সরকারি দলের মদতে। এছাড়া প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষে আকস্মিকভাবে ২০২১-এর এপ্রিল মাসে সমস্ত কেমিক্যাল সারের উপর সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে সমস্ত চাষে একমাত্র জৈব সার ব্যবহারের করার ফরমান দেন। তিনি কত পরিবেশবান্ধব এই চমক দিতে গিয়ে অপরিকল্পিত এই পদক্ষেপে দেশের কৃষি উৎপাদন, বিশেষত ধান এবং খাদ্য ফসলের চাষ মারাত্মকভাবে মার খায়। এরপর অক্টোবরে তিনি হঠাৎ এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে রাসায়নিক সারের আমদানির জন্য বেসরকারি মালিকদের ছাড়পত্র দেন। কৃষকদের জন্য সারে ভর্তুকি তুলে দেন তিনি। মূলত ভারত থেকে প্রচুর তরল নাইট্রোজেন সার আমদানি করে চড়া দামে কোম্পানিগুলি সে দেশের বাজারে ছাড়তে থাকে। এর ধাক্কায় নতুন করে ৫ লক্ষের বেশি কৃষিজীবী মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে নেমে গেছে।

২০২০ সালের পর কোভিডজনিত আর্থিক ক্ষতি থেকে দেশকে টেনে তোলার অজুহাতে পুঁজিপতিদের বিপুল কর ছাড় দিতে শুরু করে সরকার। পর্যটনকে রপ্তানি হিসাবে গণ্য করে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কর এই ক্ষেত্রের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের জন্য মকুব করে দিয়েছে তারা। ফলে সরকারি কোষাগার ক্রমাগত দেউলিয়া হয়েছে। এই কারণে কোভিডজনিত দুঃসময়ে যখন দেশের সাধারণ মানুষ হাহাকার করছেন, ঠিক সেই সময় অন্য পুঁজিবাদী দেশের মতোই শ্রীলঙ্কার ধনকুবেরদের গায়ে এর কোনও আঁচড়ই পড়েনি। বরং তারা এই সময় বাড়তি মুনাফা করেছে। ২০২১-এর এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যেই শীর্ষ ৯ জন ধনকুবেরের আয় হয়েছে ৩৬৪ বিলিয়ন শ্রীলঙ্কান রুপি। তাদের মুনাফা বেড়েছে ১৮৯ শতাংশ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শাসকদের সীমাহীন দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ। বর্তমান প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপক্ষের দাদা ছিলেন এতদিন প্রধানমন্ত্রী, পরিবারের সাতজন সদস্য মন্ত্রিত্ব সহ নানা সরকারি পদ অলঙ্কৃত করেছেন। এই মন্ত্রীদের সম্বন্ধে যেমন বেআইনি সম্পত্তির পাহাড় গড়ার অভিযোগ আছে, তেমনই অন্য যারাই ক্ষমতায় বসেছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে বিলাসী জীবন ও বিপুল সম্পত্তি বানানোর। শাসকদল এসএলপিপি (শ্রীলঙ্কা পোদুজনা পেরামুনা) উগ্র সিংহলি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। আসলে এসএলপিপি একা নয়, এই উগ্র সিংহলি জাতীয়তাবাদে ভর করেই দীর্ঘ সময় ধরে শ্রীলঙ্কার শাসকরা জনগণের ক্ষোভকে চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ১৯৮০-র দশকের শেষভাগ থেকে শ্রীলঙ্কায় যে সরকারই এসেছে তারা ক্রমাগত জনগণের সামাজিক সুরক্ষা খাতে খরচ ছাঁটাই করেছে। এর ধাক্কায় জনগণের মধ্যে দারিদ্র, সুষম খাদ্য-পুষ্টির অভাব, বেকারত্ব যখন বেড়ে চলেছে, শ্রীলঙ্কার শাসকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তামিল জনগোষ্ঠীর বিরোধে ইন্ধন দিয়ে জনগণের দৃষ্টিকে মূল সমস্যা থেকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তামিলদের উন্নয়নের প্রধান দাবিগুলিকে অবহেলা করে তাদের উপর ১৯৮৩ থেকে '৮৭-'৮৮ পর্যন্ত ভয়াবহ নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে সরকার। বর্তমান শাসকরাও কোনও না কোনওভাবে ২০২০-র নির্বাচনের আগেও মূলত ভাষাগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর (তামিল, মুসলিম ও খ্রিস্টান) বিরুদ্ধে উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তুলেই রাজাপক্ষের দল ক্ষমতা দখল করেছিল।

শ্রীলঙ্কার মতো ভৌগোলিক-সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দ্বীপরাষ্ট্রকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের আকর্ষণ বেশি এবং তা নিয়ে টানাটানি আছে। যতদিন বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল, শ্রীলঙ্কার শাসকরা বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে কিছুটা রেহাই পেতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনের সাথে মিত্রতার মধ্য দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখত। কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক স্লোগান দিয়ে তারা নিজের দেশের জনগণকেও ভুলিয়ে রাখতে চাইত। পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দুর্বলতার কারণে মার্কিন-ব্রিটিশ পুঁজি এই দেশে তাদের প্রভাব বাড়াতে থাকে। ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর হয়ে জাহাজ চালাচলের রাস্তা পুরোপুরি নিজেদের দখলে রাখতে শ্রীলঙ্কা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি মালিকরাও নিজের প্রভাবাধীন অঞ্চল হিসাবে শ্রীলঙ্কাকে পেতে শ্রীলঙ্কার তামিল জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতার মনোভাবকে উস্কানি দিয়ে সেখানে ঢুকতে চায় এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। পরে সে দেশের সরকার নতি স্বীকার করলে ভারত সরকারই তামিল উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন এলটিটিই-কে দমন করার নামে শ্রীলঙ্কায় সরাসরি সেনা পর্যন্ত পাঠায়। এই আবহে ১৯৮৭ সালে ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তিকে শ্রীলঙ্কার জনগণের বড় অংশ দাদাগিরি হিসাবেই দেখেছে। তাদের কাছে এটা ছিল জাতীয় অবমাননার নামান্তর। সে ক্ষত আজও শুকোয়নি। এদিকে ভারতের পুঁজিপতিরা কখনও সার, কখনও বিদ্যুৎ বা অন্য ক্ষেত্রে বিপুল লগ্নি করেছে। এখন আদানি গোষ্ঠী নানা পথে বিপুল বিনিয়োগ নিয়ে শ্রীলঙ্কায় ঢুকছে। সমাজতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীতে পরিণত পুঁজিবাদী চিনও শ্রীলঙ্কায় বন্দরের নিয়ন্ত্রণ সহ নানা বিনিয়োগে ঢোকার জন্য ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপানকে সাথে নিয়ে যে কৌশলগত অক্ষ গড়ে তুলতে চাইছে সেক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কায় চিনের প্রভাববৃদ্ধি তাদের পক্ষে ক্ষতিকর। ফলে এই অক্ষ এবং চিনের প্রবল টানাটানির মধ্যে পড়ে যায় শ্রীলঙ্কা। চিন চাপ দিতে থাকে আইএমএফ-এর সাথে তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। তার জন্য চিন নিজে (৬৫০ কোটি ডলার) এবং বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে দিয়ে ঘুরপথে সহজ শর্তে শ্রীলঙ্কাকে ঋণ দিয়েছে। ভারতও তার প্রভাব বজায় রাখতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই এবারের সংকটের সময় দেখা গেল ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী সর্বাগ্রে ছুটে গেছেন। ভারত সরকার ২৫০ কোটি ডলার ঋণও পাঠিয়ে দিয়েছে। তিনি এমনকি সাংবাদিকদের সাক্ষী রেখে পেট্রলপাম্পে লাইন দিয়ে থাকা মানুষের সাথেও কথা বলেছেন। অথচ ফ্রন্টলাইন পত্রিকার সাংবাদিক লিখছেন, শ্রীলঙ্কায় যখন আন্দোলন শুরু হল সে দেশের জনগণের মধ্যে ভারত বিরোধিতার সুর ছিল স্পষ্ট। ভারত সরকার যতই শ্রীলঙ্কার তামিল জনগোষ্ঠীর ত্রাতা সাজার চেষ্টা করুক, এই জনগোষ্ঠীও ভারত সরকারের উপর ক্ষুব্ধ। যে কারণে গণবিক্ষোভ ফেটে পড়তেই এখন ভারত সরকার বলতে শুরু করেছে সরকার নয়— আমরা শ্রীলঙ্কার জনগণের সাথে মৈত্রী চাই। চিনও তার সুর নরম করে একটু স্থিতিশীলতা চাইছে।

শ্রীলঙ্কার মানুষ আজ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। তাঁরা বহু বিপদের ঝুঁকি নিয়েও লড়ছেন। কিন্তু এই আন্দোলন কতদূর যাবে তা নির্ভর করবে এর রাজনৈতিক দিশার উপর। গত মার্চ মাসে যখন শুরু হয়েছে তখন থেকেই এই আন্দোলনকে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম অরাজনৈতিক হিসাবে দেখাতে চাইছে। প্রথম দিকে জোরদার ভাবে শুরু হয়েও কিছুদিন পর যখন এই আন্দোলন কিছুটা ঝিমিয়ে গিয়েছিল তখন বৃহৎ সংবাদ মাধ্যম এটাকে সোস্যাল মিডিয়ার আন্দোলন আর কিছুটা যেন পিকনিকের মতো অবস্থান-ধর্না বলে তুলে ধরছিল। জনগণ যাতে রাস্তায় না নামে, অথচ জ্বালাময়ী বক্তৃতার মধ্য দিয়ে কিছুটা ক্ষোভ বেরিয়ে গিয়ে আবার স্থিতিশীলতায় ফিরে আসে এজন্য এই 'হাসট্যাগ ৩৯' নাম দিয়ে এর পিছনে টাকা ঢালছিল বড় কোম্পানিগুলিও। যার তীব্র প্রতিবাদ করে 'সিলোন কমিউনিস্ট ইউনিটি সেন্টার' বলেছিল, আরব বসন্তের উদাহরণ টেনে এই আন্দোলনকে নির্বিষ করার যে চেষ্টা হচ্ছে তা থেকে জনগণকে সচেতন থাকতে হবে। তারা প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিকে প্রধান দাবি করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়। এই দল বামপন্থী শক্তিগুলি এবং সৎ মানুষদের এগিয়ে এসে জাতিবাদী, সাম্প্রদায়িক মানসিকতামুক্ত হয়ে একত্রে লড়বার আহ্বান জানিয়েছে।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষ কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে রক্ত দিতে প্রস্তুত। এদিকে শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বামপন্থী-সাম্যবাদী আন্দোলনের দুর্বলতার জন্য শ্রীলঙ্কার জনগণের এই আত্মত্যাগকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে কিনা সেটা যে কোনও মুক্তিকামী মানুষকেই ভাবাচ্ছে। সে দেশে একজন প্রেসিডেন্টের বদলে হয়ত আর একজন প্রেসিডেন্ট আসবে। কিন্তু জনগণের জীবনের মূল সমস্যার সমাধান হবে না, যদি না এই লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল সে দেশে শক্তি অর্জন করে পুঁজিবাদী শোষণচক্র থেকে মুক্তির রাস্তায় লড়াইকে নিয়ে যেতে পারে। আশার কথা হল সরকারের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে সে দেশের সিংহলি, তামিল, বৌদ্ধ, মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান সহ সমস্ত জনগোষ্ঠী একযোগে লড়াইয়ে নেমেছেন। এই ঐক্য সুদৃঢ় হোক— এই আশা নিয়েই ভারতের মুক্তিকামী মানুষ প্রতিবেশী দেশের সাধারণ মানুষের লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছে।

সর্বভারতীয় সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হলেন নন-রেগুলার অধ্যাপকরা

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ ও বাজেট বরাদ্দ, নিয়মিতকরণ করে ৬৫ বছর পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কাজের সুযোগ, সম কাজে সম বেতনের নীতি চালু করে সুনির্দিষ্ট বেতনকাঠামো ও ছুটির নিয়ম, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত নীতি নির্ধারক বডিতে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ইত্যাদি দাবিতে ৮ মে নন-রেগুলার অধ্যাপকদের সর্বভারতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল দিল্লির হিন্দি ভবনে। দেশের ২৫টি রাজ্য থেকে উপস্থিত ছিলেন দুই শতাধিক প্রতিনিধি। এ ছাড়াও সারা দেশের সহস্রাধিক অধ্যাপক ভার্চুয়াল মোডে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। যে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত হতে পারেননি, তাঁরা লিখিত বক্তব্য পাঠান।

কনভেনশনে আগত বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের চরম শোষণ-বঞ্চনার ছবি তুলে ধরেন। লড়াই আন্দোলনের চাপে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়িত্বের দাবি আদায় হলেও অন্য কোনও রাজ্যে নন-রেগুলার শিক্ষকদের এই অধিকার নেই। প্রতিনিধিদের বক্তব্যে হরিয়ানা, কেরালা, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যের নন- রেগুলার অধ্যাপকদের চরম শোষণ-বঞ্চনার ছবি উঠে আসে। সম্মেলনে উপস্থিত রাজ্যগুলির প্রতিনিধি সহ শিক্ষাবিদরা সকলেই বলেন, সব রাজ্যেই অ্যাড-হক অধ্যাপকরা উচ্চশিক্ষা দান করেন। অথচ তাঁদের সীমাহীন শোষণ-বঞ্চনার বিষয়ে ইউজিসি নির্বিকার, চরম উদাসীন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি।

অ্যাড হক অধ্যাপকদের প্রতি সরকারের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলে ন্যায্য দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে কনভেনশন থেকে কর্ণাটকের অধ্যাপিকা সুমিতা এস-কে সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৫টি রাজ্যের অ্যাড হক অধ্যাপকদের সর্বভারতীয় সংগঠন অল ইন্ডিয়া কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (নন রেগুলার) গঠিত হয়। আগামী জুন মাসে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সমস্ত রাজ্যের শিক্ষকদের গণস্বাক্ষর নিয়ে দাবি সনদ পেশ করা হবে। জুলাই মাসে প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে ডেপুটেশন ও রাজ্য কনভেনশন সংগঠিত করা হবে।

বীরভূমে যুবসভা

১৫ মে মুরারই-এ অনুষ্ঠিত হল এআইডিওয়াইও-র বীরভূম জেলা আলোচনা সভা। বেকারি, অপসংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও যুব জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বরেণ্য মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। সকলেই গভীর আগ্রহের সাথে আলোচনা শোনেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জী।

স্কুল খোলার দাবি শিক্ষকদের

গরমের অজুহাতে ৪৫ দিনের ছুটি কমানোর দাবিতে ৫ মে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (বিপিটিএ) কলেজ স্কোয়ারে বিক্ষোভ দেখায়। 'আর ছুটি নয়', আমরা স্কুলে পড়াতে চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড বুকে নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সতীশ সাউ, দীপঙ্কর মাইতি, সমীর বেরা, ফরিদা ইয়াসমিন, বিকাশ নস্কর প্রমুখ। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের পক্ষে অধ্যাপক তরুণ দাস। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি মোসাব্বর হোসেন।

এই দীর্ঘ ছুটির প্রতিবাদ করে সমিতির পক্ষ থেকে গত ২৮ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিবের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়ে তা পুনর্বিবেচনার দাবি করা হয়। সমিতির পক্ষ থেকে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে ২ মে একটি জনস্বার্থ মামলাও দায়ের করা হয়।

এআইকেকেএমএস-এর নদীয়া জেলা সম্মেলন

ধান, পাট, গম, আলু সহ সমস্ত কৃষিপণ্যে এমএসপি আইনসঙ্গত করা, সস্তায় সার সহ সকল কৃষি উপকরণ সরবরাহ, বিনা সুদে গরিব চাষিদের ব্যাঙ্ক ঋণ, গ্রামীণ বেকারদের সারা বছরের কাজ ও মজুরি বৃদ্ধি, খরা বন্যা রোধ করে সব কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবিতে ১৩ মে এআইকেকেএমএস-এর চতুর্থ নদীয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সেখ খোদাবক্স এবং দিল্লির কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ। কমরেড মহিউদ্দিন মণ্ডলকে সভাপতি ও কমরেড কামালউদ্দিন সেখকে সম্পাদক করে ৫২ জনের জেলা কমিটি হয়।

ব্যাঙ্কের নিরাপত্তারক্ষীদের গণছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় নিরাপত্তারক্ষীদের গণছাঁটাইয়ের নোটিসের বিরুদ্ধে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সিবিইইউএফ-এর নেতৃত্বে ৪ মে ব্যাঙ্ককর্মীরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন

জলপাইগুড়ি

গাজল, মালদা

চটশিল্পের সঙ্কট

একের পাতার পর

একশ্রেণির ব্যবসায়ী এবং একশ্রেণির চটকল মালিক এই কালোবাজারিতে জড়িত। কাঁচা পাটের মজুতদারি ও কালোবাজারি বন্ধ করতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালুর দাবি জানিয়েছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৪ মে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী পীযূষ গয়ালকে এই দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন। রাজ্যে চটশিল্পের সঙ্গে ২.৫ লক্ষ শ্রমিক এবং ৪০ লক্ষ পাটচাষি যুক্ত রয়েছে। এদের স্বার্থেই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা জরুরি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত পাটনীতির জন্য এরা বিপন্ন। কেন্দ্রীয় সরকার পাটের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে সিন্থেটিক বস্তার ব্যবহার বাড়াচ্ছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে। এটা প্রকৃতির পক্ষেও ক্ষতিকর। পাটতন্তু হল স্বাস্থ্যসম্মত তন্তু যা প্রকৃতিতে সহজেই মিশে যায়। এর ব্যবহারই তো গুরুত্ব দিয়ে বাড়ানো উচিত। ১৯৮৭ সালে দেশে চটের বস্তার অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহারের আইন চালু হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকারের বিনিয়ন্ত্রণ ও বিলগ্নিকরণের নীতির ফলে এবং সঠিক পাটনীতির অভাবের ফলে চটশিল্প মার খাচ্ছে এবং অস্বাস্থ্যকর সিন্থেটিক প্যাকেজিংকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে সরকার সার, সিমেন্ট সহ খাদ্যদ্রব্য প্যাকেজিং-এও সিন্থেটিক বস্তার ব্যবহারের ঢালাও নীতি নিয়ে চলছে। সঙ্কট বাড়ছে চটশিল্পের। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য প্রায় ৭০ শতাংশ চটের বস্তা কেন্দ্রীয় সরকারকে কিনতে হয়। সরকার আবশ্যিকভাবে চটের বস্তা কিনলে সংকট এরূপ স্তরে পৌঁছত না।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দাবি— সরকারকে জুট কমিশনের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি পাট কিনতে হবে এবং সেই পাট জুটমিলগুলিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে পাট সংরক্ষণ ও বিক্রয় করতে হবে। অবিলম্বে সমস্ত বন্ধ চটগুলি খুলতে হবে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দিতে হবে। পাটের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে এবং খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেজিং-এ অস্বাস্থ্যকর সিন্থেটিক বস্তার ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

সর্বহারা বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক

কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মৃতি অম্লান রাখতে হবে

পুরানো কেন্দ্রীয় অফিসের প্রতিরূপ উন্মোচন করে কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের আহ্বান

এইমাত্র আমরা আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরানো অফিসের প্রতিরূপ (রেপ্লিকা) উদ্বোধন করলাম। আমি আনন্দিত যে, আপনারাও এর সাথী হলেন। এটা একটা আনুষ্ঠানিকতা নয়। এটা একটা বৈপ্লবিক কর্তব্য। আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, আমাদের যে পুরনো অফিসটি ছিল, সেটি যখন নতুন করে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত হল, তখনই আমরা এর একটা প্রতিরূপ সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। একটা সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, আজকে সেটা একটা সুষ্ঠুরূপ পেল এবং আগামী দিনে এটা একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে।

আপনারা অনেকে নাও জানতে পারেন যে, পার্টি প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর ১৯৫০ সালে, আমাদের এই ৪৮ লেনিন সরণিতে একটি ছোট ঘরের মধ্যে আমাদের দলের অফিসকেন্দ্রিক কার্যকলাপের সূত্রপাত ঘটে। এই অফিসেই প্রতিদিন সকাল এবং বিকালে প্রিয় মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ উপস্থিত হতেন। আমরা আমাদের ছাত্র অবস্থা থেকেই দেখেছি, কীভাবে এই বাড়িটাতে বসে, প্রায় সারা দিন, রাত ১১টা পর্যন্ত উনি পার্টি পরিচালনা করতেন এবং পার্টির নেতা, কর্মী এবং অন্য যারা পার্টিকে জানতে চান, বুঝতে চান এমন সব ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। পার্টির বিভিন্ন জায়গার কমরেডরা, যা যা নতুন যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে, সিনিয়র, জুনিয়ার, নেতা-কর্মী, কমরেড সবার সঙ্গেই তিনি এই অফিসে মিলিত হচ্ছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করছেন, কথাবার্তা বলছেন, প্রত্যেককে নতুন করে জীবনের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন এবং এই ভাবেই তাঁদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। এই ৪৮ লেনিন সরণির সিঁড়ি পার হয়ে যখন তাঁরা ফুটপাতে পা দিচ্ছেন, তাঁরা ভিন্ন মানুষ হয়ে যাচ্ছেন। এই ভাবেই এই, ৪৮ লেনিন সরণি হয়ে উঠেছিল পার্টির বিপ্লবী কার্যকলাপ গড়ে তোলার মূল আধার, মূল কেন্দ্রবিন্দু। এই ভাবেই এটি হয়ে উঠেছে একটি ঐতিহাসিক স্থান।

২০১২ সালে যখন নতুন ভাবে একটি বৃহৎ অফিস গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হল তখন আমাদের মনে এই ভাবনাও এসেছিল যে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মৃতি বিজড়িত এই ভবনটিকে, পুরনো অফিসটাকে সংরক্ষণ করেই আমরা তার পাশাপাশি নতুন অফিসটি গড়ে তুলতে পারি কি না। কারণ পুরনো অফিসটি সংরক্ষণ করার একটা অত্যন্ত ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু আমাদের হাতে লাগোয়া কোনও প্লট ছিল না। তাই এই অফিসটি ভেঙেই সেখানে নতুন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নতুন অফিস তৈরির সিদ্ধান্ত নিতে হল। তখনই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, একটি প্রতিরূপ তৈরি করে পুরনো অফিসটাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে আকর্ষণীয়ভাবে যার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে আমাদের উত্তরসাধকরা, এই পুরনো অফিসটির একটা আভাস পেতে পারে। আমি এ কথা আপনাদের স্মরণ করাতে চাই যে, এটা কোনও অবহেলা করার মতো বিষয় নয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই সারা বিশ্বেই যত মহান কার্যকলাপ হয়েছে, যত মহান ব্যক্তি এই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন, ভারতবর্ষে কেবল নয়, গোটা বিশ্বেই এই ধরনের সকল কিছুর স্মৃতি রক্ষা, স্মরণীয় যাঁরা তাঁদের স্মরণ করার, লেখার মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্মরণ করা, আবার এই সমস্ত স্মৃতিচিহ্নগুলোকে যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করা এবং তার থেকে উদ্দীপ্ত হওয়া, এইটিই সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে রীতি হয়ে রয়েছে।

পুরনো কেন্দ্রীয় অফিসের প্রতিরূপ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পরে যে বিশাল মিছিল হয়েছিল তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। মহান শহিদ যতীন দাসের মৃত্যুতে গোটা পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে তাঁর শেষযাত্রায় ভেঙে পড়েছিল তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। কলকাতা শহরের যে জায়গায় তাঁকে দাহ করা হয়েছিল, সেই জায়গায় তাঁর স্মৃতিতে একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলা হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ তো ঐতিহাসিক। সাধারণ মানুষের দানে কলকাতার কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে তৈরি হয়েছিল সুবৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভ। মহান মানুষকে, মহামানবদের মানুষ এই ভাবেই স্মরণ করতে চায় বরাবর, চিরদিন।

১৯৭৬-এর ৫ আগস্ট যখন কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনাবসান হল, তখন তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে আমরা কয়েকজন আলোচনা করেছিলাম, কমরেড শিবদাস ঘোষকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য ঐতিহাসিক বিপ্লবী প্রয়োজনে আমরাও এই ধরনের কোনও ব্যবস্থা করতে পারি কি না! যেখানে আমরা তাঁকে সমাহিত করতে পারি পরবর্তী সময়ে সেখানে যাতে আমরা একটা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে পারি। আলোচনা করে দেখা গেল আমাদের সীমিত শক্তিতে সেদিন আমরা কোনও জায়গাই ব্যবস্থা করতে পারলাম না। তাই সেদিন তা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

তাঁর মহান বিপ্লবী শিক্ষাকে তো বটেই কমরেড শিবদাস ঘোষকে যতরকম ভাবে পারা যায়, স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। ইতিমধ্যেই আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কমরেড শিবদাস ঘোষ টালাতে যে বাড়িতে থাকতেন সেই ২৮সি বনমালী চ্যাটার্জী স্ট্রিট বাড়িটিকে একটি মহান স্মৃতি ভবন হিসাবে সংরক্ষণ করার। কমরেড শিবদাস ঘোষ যেখানেই গিয়েছেন সেই সব জায়গাতেও আমরা চেষ্টা করব, আগামী দিনে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য। এই প্রসঙ্গে আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই।

১৯৭৮ সালে কোনও একটা কারণে আমি রাজগির গিয়েছিলাম। সেখানে খননকাজের মধ্য দিয়ে যে সুবিশাল অতি প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আবিষ্কৃত হয়েছে তা আমি দেখতে গিয়েছিলাম। আর্কিওলজি বিভাগ সেখানে মিউজিয়াম তৈরি করে রেখেছে। সেই খননকাজে যা উদ্ধার হয়েছে, সেখানে সবকিছু সংরক্ষিত আছে। আমার স্ট্রাইক করেছিল যে পয়েন্টটা তা হল, গৌতম বুদ্ধের মূর্তি গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় স্তূপীকৃত হয়ে আছে। মনে হয়েছে, কে কেমন করে বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করতে পারে তার যেন একটা প্রতিযোগিতা হয়েছে। যে চৌহদ্দিটা ছিল, এখানে, ওখানে, সেখানে, পা-ফেলা যাচ্ছে না, বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধের মূর্তি ঠাসা হয়ে আছে। আমি এটা উল্লেখ করতে চাই যে, সেদিনের বুদ্ধের চিন্তার যে প্রগতিশীল দিকটা ছিল, তার ভিত্তিতে মানুষের যে আকুতি, এগুলোর মধ্য দিয়ে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

মহান ব্যক্তিদের, বড় মানুষদের প্রতিদিন নানাভাবে স্মরণ করতে হয়। তাঁদের প্রত্যেক পদক্ষেপে স্মরণ করতে হয় এবং স্মরণ করবার কিছু উপায় অবলম্বন করতে হয়। তার মধ্যে এই ধরনের কাজও আছে। আমি খুব আনন্দিত যে আমাদের দলেরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ কয়েকজন কমরেডের তত্ত্বাবধানে বিশেষ করে কমরেড মিহির রায়, আর তাঁর সহযোগীদের তত্ত্বাবধানে, দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তাঁরা এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

মৃত্যুর এত বছর পর আজও, গোটা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি, সৎবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মার্কসকে স্মরণ করছে কীভাবে? তার কি কোনও সীমা আছে? এঙ্গেলসকে, লেনিনকে স্মরণ করার কি কোনও সীমা আছে? মস্কোয় লেনিন মুসোলিয়ামের ধাঁচে বিশ্বে আরও ৫/৭ টা মুসোলিয়াম হতে পারে, মাও-সে-তুঙের স্মরণে বেজিং-এ বিশাল মুসোলিয়াম রয়েছে। মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর মস্কোয় তাঁর স্মরণে একটি বিশাল মুসোলিয়াম নির্মিত হয়েছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষও সেই স্তরের নেতা। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সে-তুঙ, শিবদাস ঘোষ, এই যে মহান চিন্তাবিদ, মার্কসবাদের মহাজ্ঞানী মহাজন, তাঁদেরকে, তাঁদের শিক্ষাগুলোকে তুলে ধরা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, তারই একটা নজির হচ্ছে এই প্রতিরূপ নির্মাণ এবং সংরক্ষণ করার কাজ। আমরা এখনও করণীয় বহু কিছু করতে পারিনি।

এই প্রসঙ্গে এই কথাটিও আমি বলতে চাই যে, স্মরণ যেন ঠিক ঠিক মতো হয়। শ্রদ্ধা প্রদর্শন যেন ঠিক ঠিক মতো হয়। আরও উন্নততর ধরনে, আরও ছড়িয়ে। কমরেড শিবদাস ঘোষের স্ট্যাচু আমরা ঘাটশিলায় স্থাপন করেছি। আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে পরিস্থিতি অনুকূল হলে কমরেড শিবদাস ঘোষের এই মূর্তিটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেও নির্মাণ করা। এটা ঐতিহাসিক কর্তব্য। সেই প্রয়োজনেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁর চিন্তাধারাকে নিয়ে যেতে হবে, কারণ তিনিই হচ্ছেন ভারতবর্ষের সর্বহারা বিপ্লবের পথিকৃৎ, কংক্রিট এক্সপ্রেশন, মূর্ত প্রতীক। তাই এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাঁর স্মৃতিকে চির জাগরূক রাখতে হবে, তাঁকে জীবন্ত করে রাখতে হবে, বিভিন্ন ভাবে। তাঁর ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। কিছু কিছু জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে ঘাটশিলায় রাখা আছে। কিছু কিছু ব্যবহৃত জিনিসপত্র ২৮সি বনমালী চ্যাটার্জী স্ট্রিটে সংরক্ষিত আছে। আরও বিভিন্ন জিনিস যেখানে যেখানে ছড়িয়ে আছে সেগুলি সংগ্রহ করতে হবে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যে ক'দিন বেঁচে ছিলেন, ৪৫-৪৬ বছর, এই বিশাল ভারতবর্ষের একেবারে ভেতর পর্যন্ত তিনি গিয়েছেন। বর্তমান বাংলাদেশের, সেই সময়কার পূর্ববঙ্গের, এমনকি

সাতের পাতায় দেখুন

ন্যূনতম বাকস্বাধীনতাও আজ সরকার দিতে রাজি নয়

গুজরাটের নির্দলীয় বিধায়ক জিগ্নেশ মেওয়ানিকে সরকারবিরোধী একটি টুইট করার 'অপরাধে' অসম পুলিশ মাঝরাতে গুজরাট গিয়ে গ্রেপ্তার করে। শুধু তাই নয়, ওই অভিযোগ থেকে জামিন পেয়ে যাওয়ার পরেও হেফাজতে থাকাকালীন এক মহিলা পুলিশকর্মীকে অশ্লীল মন্তব্য, হেনস্থা ইত্যাদির অভিযোগে আবার গ্রেপ্তার করা হয়।

কী ছিল সেই টুইটের বিষয়বস্তু? কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমালোচনা করা হয়েছিল তাতে। কথা প্রসঙ্গে এসেছিল নাথুরাম গডসে, গুজরাটের হিংসা এবং নরেন্দ্র মোদীর কথা।

সেই অপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হল বিজেপি শাসিত রাজ্য অসমে। অসম পুলিশ মধ্যরাত্রে গুজরাট গিয়ে ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে গ্রেপ্তার করে অসম নিয়ে আসে। কোকরাঝাড় আদালত এই মামলায় জামিন মঞ্জুর করলেও বরপেটা পুলিশ দ্বিতীয় অভিযোগে তাকে আবার গ্রেপ্তার করে। সংবাদে প্রকাশ গোয়ালপাড়ায় তার বিরুদ্ধে তৃতীয় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এই অভিযোগ ও গ্রেপ্তারের চক্রান্ত এতটাই নগ্ন ভাবে সাজানো যে আদালত পর্যন্ত মামলাগুলোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলতে বাধ্য হয়েছে।

এ ধরনের ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন বা চমকে উঠবার মতো নয়, বিশেষ করে আমাদের দেশে তো নয়ই। অভিযুক্ত জিগ্নেশ মিডিয়ায় পরিচিত মুখ, সর্বোপরি তিনি একজন নির্বাচিত বিধায়ক বলে এই গ্রেপ্তার এতখানি আলোচ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ বিরোধী স্বরের কণ্ঠরোধ ক্ষমতার রাজনীতির 'আইডেন্টিটি' হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস জমানাতে নানা কালাকানুন এনে অথবা বিরোধীদের গুম খুন বা মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে থামিয়ে দেওয়ার যে সর্বনাশা ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছিল বিজেপি শাসনামলে আরও ব্যাপ্তি ও তীব্রতা নিয়ে সেই দমন পীড়ন আজ তার দাঁত নখ বের করেছে।

নাগরিক জীবনের অধিকার, গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রতিদিন চরমভাবে পদদলিত হচ্ছে যার বেশিরভাগের খবর সাধারণ মানুষ জানতে পারে না। ডাঃ বিনায়ক সেন, সমাজসেবী স্ট্যান স্বামী, ছাত্র নেতা উমর খালিদ বা জিগ্নেশদের সাথে হওয়া চরম অগণতান্ত্রিক ঘটনাগুলো কখনও কখনও আমাদের চেতনার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে যায়। আমরা চমকে উঠি অথবা আতঙ্কিত হই। কিন্তু এই চমকে ওঠা বা আতঙ্ক গণতন্ত্রের নামে এই রাষ্ট্রীয় দমনকে রুখতে পারবে না। কেন এই কণ্ঠরোধ? কেন এই আক্রমণ? এর সমাধান কোথায়? এর উত্তর আজ খুঁজতে হবে।

একথা অনস্বীকার্য যে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশই আজ ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য নিয়েই অবস্থান করছে। চূড়ান্ত কেন্দ্রীভূত পুঁজি, শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র এবং অবৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন মননের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদ তার বিষাক্ত ডালপালা প্রসারিত করে। সমাজের কোনও ক্ষেত্রেই ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ আজ সে দিতে পারে না। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার, আধুনিক জীবনবোধের ধারণা নিয়ে আসা বুর্জোয়া গণতন্ত্র আজ কালের অমোঘ নিয়মে তার সকল প্রগতিশীলতা হারিয়েছে। অথচ এই বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার ঊষাকালে যে চিন্তা এনেছিল, তা ভলতেয়ারের ভাষায়— "আমি তোমার মতের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতে পারি, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের অধিকার রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে রাজি আছি।" গণতন্ত্রের ঊষালগ্ন মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে এমন ধারণাই দিয়েছিল। একদা সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার মহান স্বপ্ন দেখানো গণতন্ত্র আজ ইতিহাসের অনিবার্যতায় মরণাপন্ন। যে গণতন্ত্র একদিন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিকের বাক-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য মরণপণ লড়াই করেছিল আজ সেই গণতন্ত্র নাগরিক জীবনের সমস্ত অধিকার বেপরোয়াভাবে হরণ করছে। ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও আজ সে দিতে রাজি নয়।

তাই একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কেন্দ্রীয় সরকারবিরোধী একটি টুইটও আজকের ভারতে গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়। এই সমাজব্যবস্থা আমাদের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, সীমাহীন দারিদ্র, বেকারি আর কর্মসংকোচন, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতা, পতিতাবৃত্তি, ক্ষুধা, দমনপীড়ন আর তার বিপরীতে কর্পোরেট হাঙরদের মুনাফা আর পুঁজির এভারেস্ট নির্মাণ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না।

তাই, এই পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের সেবক দলগুলোকে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ভাবেই তাদের ক্ষমতাকে ধরে রাখতে হবে। পুঁজিবাদের লুণ্ঠন-শোষণের স্টিমরোলার বিনা বাধায় যাতে চলতে পারে তার জন্যে চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদী আক্রমণ নামিয়ে আনতে হবে সর্বক্ষেত্রে। এ ছাড়া তার বেঁচে থাকার উপায় নেই। এই সেবা যে যত নিষ্ঠার সাথে করবে পুঁজিপতি শ্রেণি সেই দলের ওপর নির্ভর করবে তত বেশি। যেমন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে কর্পোরেট পুঁজির সেবায়।

মানবমুক্তির সংগ্রামের মহান শিক্ষক কমরেড স্ট্যালিন আজকের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''পূর্বে, বুর্জোয়ারা নিজেদেরকে উদারনীতিক রূপে উপস্থাপন করতো, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কথা বলতো তারা এবং এই ভাবেই তারা সমগ্র জনগণের মাঝে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এখন এই উদারপন্থার শেষ অবশিষ্টাংশটুকুও পাওয়া যায় না। 'ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা' বলে আজ আর কিছু নেই, ব্যক্তিগত অধিকার এখন শুধু পুঁজির মালিকদের জন্যই সংরক্ষিত ও স্বীকৃত। বাকি সমস্ত জনতাকেই শোষণের জন্য উপলব্ধ কাঁচা মাল হিসেবে গণ্য করা হয়। সকল দেশের সকল মানুষের অধিকারের, অর্থাৎ সাম্যের নীতিকে ধূলায় পদদলিত করে দিয়ে, আজ তার জায়গায় বিরাজ করছে সংখ্যালঘুদের শোষণ করার সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করার নীতি। শোষিত জনগণকে অধিকারচ্যুত করার নীতি। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ধ্বজা আজ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত।"

এই কারণেই সত্যিকারের গণতন্ত্র আজ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রকৃত গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা, জীবনের অধিকার সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে বুর্জোয়া রাষ্ট্র দিতে পারে না। সরকারের সমালোচনা করার জন্যই বিধায়ক জিগ্নেশ মেওয়ানিকে এভাবে হেনস্থা তা স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে।

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন

দুয়ের পাতার পর

করেছে, কারণ তিনি সরকারের বিরুদ্ধে 'উত্তেজক' লেখা লিখেছেন। তামিলনাড়ুতে 'তামিল দিবস' উদযাপন অনুষ্ঠানে 'তামিল পতাকা' তোলার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সীমান নামে তামিল নেতাকে। ২০১৯-এ পুলওয়ামায় সেনা কনভয়ে বিস্ফোরণের ঘটনার পর সোসাল মিডিয়ায় যেসব তর্কবিতর্ক হয়েছিল তার মধ্যে ২৬ জনের বিরুদ্ধে 'পাকিস্তানের পক্ষে' এবং 'দেশবিরোধী' মতামত প্রকাশ করেছেন সন্দেহে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ করা হয়। সিএএ বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলনকারীদের মধ্যে ৩৭৫৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ করা হয়েছে। ২০১৮তে ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীরা নিজেদের জমি জায়গা রক্ষায় পাথালগড়ি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধেও এই আইন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। বাস্তবে এগুলির কোনওটিই যে রাষ্ট্রদ্রোহ নয়, সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদ, তা বোঝা খুবই সহজ।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এমন একটি স্বৈরাচারী আইন স্বাধীন ভারতে থেকে গেল কী করে? ভারত রাষ্ট্রের জন্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত ঔপনিবেশিক ভারত রাষ্ট্রটি তৈরিই হয়েছিল ভারতীয় সম্পদ লুঠ করার এবং তার বিরুদ্ধে যে কোনও প্রতিবাদ দমন করার যন্ত্র হিসাবেই। ফ্রান্স জার্মানি আমেরিকায় যে ভাবে সংগ্রামের পথে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, ভারতে তা হয়নি। আপসের পথে ব্রিটিশ শাসিত রাষ্ট্রটিই দেশীয় পুঁজিপতিদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির নির্মম শোষণ-নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবেই তা থেকে গেছে। তাই পুঁজিপতি শ্রেণির সেবক সব দলই ক্ষমতাসীন থাকার জন্য এই কুৎসিত কালা আইনটিকে অক্ষত রেখেই তার সুবিধা নিয়ে থাকে।

শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজার শাসক দলগুলি দেশের মানুষকে এ কথা ভুলিয়ে দিতে চায় যে, রাষ্ট্র আর সরকার এক নয়। সরকার হল রাষ্ট্র নামক ব্যবস্থাটির পরিচালক। সরকারি নীতির বিরোধিতা করা, শাসক নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতি-স্বৈরাচারের বিরোধিতা কিংবা প্রতিবাদ করা মানে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা নয়। সরকারের যে কোনও নীতি বা পদক্ষেপ নাগরিকদের অপছন্দ হলে তার বিরোধিতা করা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু যেহেতু বর্তমানে সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক চরিত্র হারিয়ে ফ্যাসিবাদী চরিত্র অর্জন করেছে, তাই নাগরিকদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারও আজ কোনও সরকার দিতে রাজি নয়। অথচ পুঁজিবাদী অপশাসনে দেশের নাগরিকদের ক্ষোভ বাড়তেই থাকবে এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তা মাঝে মাঝেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ফেটে পড়বে। মানুষের এই প্রতিবাদ, আন্দোলন দমন করতে ধূর্ত শাসক শ্রেণি এগুলিকে দেশদ্রোহিতা, দেশবিরোধিতা হিসাবে তুলে ধরে। এগুলির বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের আইন প্রয়োগ করে। স্বাভাবিক ভাবেই দেশের জনগণের পক্ষ থেকে বিদেশি শাসক ব্রিটিশের তৈরি দেশদ্রোহের কালা আইন বাতিলের দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত।

বিশ্বপুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও আজ গভীর সংকটে আক্রান্ত। দেশবাসীর ওপর বেপরোয়া লুট চালিয়ে তারা একদিকে টাকার পাহাড়ের উচ্চতায় ইউরোপ আমেরিকার ধনকুবেরদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, অন্য দিকে, সমস্ত দমন, নিপীড়ন, বিভেদ বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। আশার কথা, এ সব উপেক্ষা করেই নিপীড়িত মানুষ প্রতিবাদ আন্দোলনে ক্রমাগত বেশি বেশি করে সংগঠিত হচ্ছে। ঐতিহাসিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কৃষক আন্দোলন সরকারকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে। এমনকি রাজনীতি নিরপেক্ষ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী সহ সাধারণ মানুষও সোসাল মিডিয়ায়, পত্রপত্রিকায় সরকারের নির্লজ্জ কর্পোরেট তোষণনীতি, লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় অন্ধতা, সামাজিক বিদ্বেষ, নারীধর্ষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মত ব্যক্ত করছেন। বিজেপি জানে যে, এইসব প্রতিবাদীরা একটি যথার্থ নেতৃত্বে যে কোনও দিন ঐক্যবদ্ধহয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে যেতে পারে এবং তখন তার ধাক্কা সামলানো পুলিশ প্রশাসন বা আরএসএস বাহিনীর সাধ্যাতীত। তাই তারা দেশ জুড়ে জনসাধারণের মধ্যে হিটলারি জমানা বা ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার মতো একটা ভীতির পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। জনসাধারণকে বার্তা দিতে চাইছে, মুখ বুজে সব মেনে নাও, না হলেই সর্বনাশ। টুঁ শব্দটি করলেই জেলে ভরে দেওয়া হবে।

অবশ্য পৃথিবীর সব দেশে সব যুগেই ফ্যাসিস্টশাসকরা জনশক্তির থেকে নিজেদের অত্যাচার নিপীড়নের শক্তিকে বড় বলে মনে করেছে এবং সেটাই তাদের পতনের কারণ হয়েছে। হিটলার, মুসোলিনি, ইন্দিরা গান্ধী কেউই শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাননি। ফ্যাসিস্ট মোদি সরকারকেও শেষ পর্যন্ত মাথা নত করতে হবে। কিন্তু তার জন্য শুধু আদালতের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না, কারণ এই সরকার একদিকে যেমন আদালতকেও তোয়াক্কা করে না, তেমনই একটি স্বৈরাচারী সরকার সব সময় চেষ্টা করে বিচারব্যবস্থাকেও তাদের হুকুমদার হিসাবে ব্যবহার করতে। তা ছাড়া সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সংগঠিত গণআন্দোলন জোরদার হলে তা বিচারব্যবস্থাকেও নিরপেক্ষ আচরণের সাহস জোগায়। তাই এই ঔপনিবেশিক ঘৃণ্য আইন প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে সব স্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি।

ইঞ্জিন চালকের মৃত্যুর তদন্ত দাবি

১০ মে সন্ধ্যা ৬টায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সাঁতরাগাছি পুলিং শেডে কর্মরত অবস্থায় ইঞ্জিনের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট অমিতেশ বিশ্বাসের।

সাঁতরাগাছি পুলিং শেডের বর্তমানে প্রকৃত ধারণক্ষমতা ৮-১০টি ইঞ্জিনের। সেখানে ৪০-৫০টি ইঞ্জিন রেখে কাজ চালানো হচ্ছে। এর ফলে দুটি ইঞ্জিনের মধ্যে যে ন্যূনতম নিরাপদ দূরত্ব থাকার কথা তা থাকছে না, ফলে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই ঘটনার দায় সম্পূর্ণভাবে ঊর্ধ্বতন রেল কর্তৃপক্ষের। এই সমস্যার কথা আগে জানা সত্ত্বেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র হাওড়া জেলা কমিটির দাবি, ঘটনার দায় স্বীকার করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ন্যূনতম নিরাপদ দূরত্ব (মিনিমাম সেফটি ডিসটেন্স) মেনে সাঁতরাগাছি সহ সমস্ত রেল ইয়ার্ডে ইঞ্জিন চেকিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে, নিহত লোকো পাইলটের পরিবারের একজনকে চাকরি এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আন্দোলনে রাস্তা সংস্কারের দাবি আদায়

প্রায় সাড়ে ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ দেউলিয়া-খন্যাডিহি পিচ রাস্তা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। পূর্ত দপ্তরের ওই রাস্তাটি বেশ কয়েক বছর ধরেই বেহাল অবস্থায়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সহ বহু মানুষ, ট্রেকার-অটো-টোটো সহ নানা ভারী যানবাহন এবং হাজার কয়েক সাইকেল ও মোটর সাইকেল আরোহী এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করেন। গত বর্ষার পর খানাখন্দে ভরে গিয়ে যাতায়াতের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। অথচ সারানোর ব্যাপারে পূর্তদপ্তর টালবাহানা করতে থাকে।

এই অবস্থায় অতি দ্রুত রাস্তা সংস্কার শুরুর দাবিতে পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক সহ মন্ত্রী মলয় ঘটককে স্মারকলিপি দেয় দেউলিয়া-খন্যাডিহি রাস্তা উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটি। আন্দোলনের চাপে দপ্তর এ মাসের শুরুতে রাস্তাটির পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছে। বর্ষার আগেই রাস্তাটিকে যাতায়াতের উপযোগী করার দাবি জানিয়েছেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক।

এআইকেকেএমএস পূর্ব মেদিনীপুর সম্মেলন

ধান-পান-পাট-বাদাম-কাঁচালঙ্কা সহ সমস্ত কৃষিজ ফসলের লাভজনক দাম সুনিশ্চিত করা, সার-বীজ-কীটনাশক-কৃষিবিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ, নদী-নালা সংস্কার করে বন্যার স্থায়ী সমাধান, জব কার্ড হোল্ডারদের ২০০ দিনের কাজ ও ৪০০ টাকা মজুরির দাবিতে ১৫ মে অল ইন্ডিয়া কিসান ও খেতমজদুর সংগঠনের দ্বিতীয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মেচেদার বিদ্যাসাগর হলে। জেলার ২২টি ব্লকের প্রায় পাঁচ শতাধিক কৃষক ও ক্ষেতমজুর প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদেন। সম্মেলনে মূল বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শংকর ঘোষ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান। সম্মেলন থেকে উৎপল প্রধানকে সভাপতি, জগদীশ সাহুকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের একটি জেলা কমিটি গঠিত হয়।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বাঁকুড়া শহর আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড শম্ভুপদ চক্রবর্তী ২৩ ফেব্রুয়ারি রায়পাড়ায় নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। দীর্ঘদিন তিনি বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন।

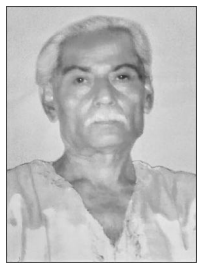

কমরেড চক্রবর্তী রেলওয়ে কর্মচারী ছিলেন। তিনি ধানবাদে দলের বিস্তারের কাজে নিয়োজিত পলিটবুরো সদস্য কমরেড প্রীতীশ চন্দের নিরলস সংগ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন এবং এই আদর্শকেই সঠিক বুঝতে পেরে তিনি দলের কাজ শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে দেশ জুড়ে রেল আন্দোলন এবং তার পরিণতিতে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট হয়। এই আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে নিজেকে যুক্ত করেন এবং বহু ঝুঁকি তাঁকে নিতে হয়।

কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ১৯৯২ সালে বাঁকুড়ায় আসেন এবং দলের কর্মসূচি ও আন্দোলনগুলিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে থাকেন। বিদ্যুতের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অ্যাবেকার সব কর্মসূচিকেই তিনি সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতেন। শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত প্রাথমিক উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষাতেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই পরীক্ষায় তিনি বেশ কয়েকবার সেন্টার ইনচার্জের ভূমিকা পালন করেছেন ও অনেক স্বেচ্ছাসেবককে যুক্ত করেছেন। মনীষী স্মরণ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে কমরেড চক্রবর্তী নিজ উদ্যোগে সামিল হতেন।

তিনি প্রায়ই তাঁর বাসস্থান এলাকা কেন্দুয়াডিহির বিভিন্ন পাড়ায় যেতেন। ভৈরবস্থান এলাকাতেও বহু মানুষের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সেখানে বসে গল্প করতেন এবং আড্ডা দিতে দিতেই দলের মুখপত্র গণদাবী ও অন্যান্য পত্রপত্রিকা দিয়ে দলের বক্তব্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। এলাকার সাধারণ মানুষের সমস্যাকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য পত্রপত্রিকাতে লেখালেখি করতেন। গরিব ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর ব্যবস্থাও করেছিলেন।

শেষের দিকে বার্ধক্যজনিত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও দলের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন। অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দি থাকাকালীন দলের নেতা, কর্মী ও অন্যান্যদের ভালমন্দের খবর নিতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

বাঁকুড়া শহর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতিচারণ করেন জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড লক্ষ্মী সরকার সহ অন্য কমরেডরা।

কমরেড শম্ভুপদ চক্রবর্তী লাল সেলাম

অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের

অষ্টাদশ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন

প্রকাশ্য সমাবেশ

১ জুন, বিকাল ৪টা, শহিদ আব্দুল ওদুদ নগর (দেবগ্রাম জেলা পরিষদ ময়দান), নদিয়া

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড সত্যবান

সর্বভারতীয় সভাপতি এআইকেকেএমএস

প্রধান অতিথি ঃ কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

ঃ বক্তা ঃ

কমরেড শঙ্কর ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক, এআইকেকেএমএস

কমরেড পঞ্চানন প্রধান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক, এআইকেকেএমএস এবং ওড়িশা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের নেতৃবৃন্দ

ঃ সভাপতি ঃ

কমরেড সেখ খোদাবক্স

রাজ্য সভাপতি, এআইকেকেএমএস

কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের আহ্বান

পাঁচের পাতার পর

আসামেরও বহু জায়গায় তিনি গিয়েছেন। আমি লক্ষ করেছি সেই সব জায়গার সংগ্রামী মানুষ এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোথায় কোথায় তিনি গিয়েছিলেন, কী ভাবে সেইসব জায়গাগুলি চিহ্নিত করে রাখা যায়, সেগুলিকে কী ভাবে স্মরণীয় করে রাখা যায়।

আজ বুর্জোয়ারা তাদের চিন্তার বাহকদের সামনে নিয়ে আসছে। কিন্তু যাঁরা বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরোধী, কত মানুষ যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, মার্কস থেকে আরম্ভ করে কমরেড মাও-সে-তুঙ, কমরেড শিবদাস ঘোষ পর্যন্ত, আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে, বুর্জোয়াদের প্রচার ছাপিয়ে যাতে তাঁদেরও আমরা ক্রমাগত সামনে নিয়ে আসতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমি এই কথাটিও উল্লেখ করতে চাই— আমরা শুধু মহান মার্কসবাদী দার্শনিক, মহান মার্কসবাদী বিপ্লবীদেরই নয়, আমরা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায়, যাঁরাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সভ্যতার বিকাশের ধারায় অবদান রেখে গেছেন এবং সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের যথাযথভাবে স্মরণ করব, স্মরণীয় করে রাখব। এই প্রসঙ্গে আমি এটাও উল্লেখ করতে চাই, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী এই যুগে বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী দেশেই পুঁজিপতিরা শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে সমস্ত মহান চিন্তাকে, মহান চিন্তাবিদদের শিক্ষাকে, তাঁদের স্মৃতিকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। এই জঘন্য চেষ্টাটাকে, চক্রান্তটাকে আমাদের প্রতিহত করতেই হবে। বিশ্ববাসীকে এই প্রশ্নে এক হয়ে লড়তে হবে। এবং পৃথিবীর সকল বড় মানুষদের স্মৃতিকে নানা ভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। এই শিক্ষাই সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দিয়ে গেছেন। এটা খেয়াল রাখতে হবে, তাঁর স্মৃতিচারণটা যেন গুরুত্ব সহ পরিচালিত হয়। এটা বাদ দিয়ে বিপ্লব হবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, প্রত্যেক বিপ্লব, তার কংক্রিট এক্সপ্রেশনের (বিপ্লবের প্রতীক) জন্ম দেয়। এই ভাবেই রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি জন্ম দিয়েছে লেনিনের, চীনের শ্রমিক শ্রেণি জন্ম দিয়েছে মহান মাও-সে-তুঙের। ভারতবর্ষের মাটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ হচ্ছেন কংক্রিট এক্সপ্রেশন অফ ইন্ডিয়ান রেভলিউশন। তাই পার্টির আগের অফিসের এই প্রতিরূপ নির্মাণ সেই সংগ্রামেরই অংশ। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এটাকে আরও উন্নততর ভাবে নিয়ে আসা যায় কি না তাও দেখতে হবে। আমি আবারও বলব, এই রকমের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে, আমাদের আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনাটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। আগামী দিনে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাঁরা বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হবে, তাঁরাও যেন আমাদের এই পুরনো অফিসের প্রতিরূপ দেখে উদ্দীপ্ত হয়, সেটা আপনারা লক্ষ রাখবেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

এক কোটি প্রতিবাদী স্বাক্ষর সংগ্রহে এআইডিএসও

কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচিতে নামল এআইডিএসও। ১ মে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। চলবে ২৮ সেপ্টেম্বর শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর জন্মদিবস পর্যন্ত ১৫০ দিন। কেন এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ? কারণ এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণের সিংহদরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস-বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটানো হচ্ছে। শিক্ষার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সার্বজনীন চরিত্র বলে কিছু থাকছে না। এর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। উদ্বোধন করেন— অধ্যাপক রাম পুনিয়ানী, প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল (পশ্চিমবঙ্গ) বিমল চ্যাটার্জী, অধ্যাপক বীরেন্দ্র নায়ক, অধ্যাপক নন্দিতা নারায়ণ, বিজ্ঞানী সৌমিত্র ব্যানার্জী, ডঃ রাজেশ কাকতি, অধ্যাপক হেমন্ত কুমার শাহ, অধ্যাপক কে অর্বিন্দাক্ষণ, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, অধ্যাপক খারভেলা মোহান্তি, ডঃ স্বাতিবেন যোশী প্রমুখ।

মিড-ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

১৪ মে ভিওয়ানিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত হরিয়ানা রাজ্য মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে মিড ডে মিল কর্মীদের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং প্রশাসনিক আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মাসিক মাত্র ৩,৫০০ টাকা বেতন, গত চার বছর ধরে বেতন না বাড়ানোর প্রতিবাদে এবং সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি সহ নানা দাবিতে মিছিলে সামিল হন হাজার হাজার মিড ডে মিল কর্মী

বিষ্ণুপুরে গ্রাহক ডেপুটেশন

বাঁকুড়ায় সম্প্রতি ঝড়-জলে মারাত্মক বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে। শতাধিক গ্রামগঞ্জ শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক দিন পাম্প না চলায় পানীয় জলও অমিল। গ্রীষ্মের দাবদাহে ফ্যান আলো বন্ধ। গ্রাহক হয়রানি চরমে। অবিলম্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করা, ভুতুড়ে বিল সংশোধন সহ ১২ দফা দাবিতে ৬ মে বিষ্ণুপুর ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি গরিবের শিক্ষা কেড়ে নিচ্ছে

প্রতিবাদে দিল্লিতে ধরনা শিক্ষাবিদদের

৯ মে দিনটি ছিল মহান মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। বিজেপি সরকারের আনা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র বিরুদ্ধে সেদিনই রাস্তায় নামলেন সারা দেশের শিক্ষাবিদরা। ওই দিন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ডাকে নানা রাজ্য থেকে আগত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী মানুষ সমবেত হয়েছিলেন দিল্লির যন্তর মন্তরে। বহু বাধা অতিক্রম করে দেশের সব প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা ধরনাস্থলে পৌঁছান। সভা পরিচালনা করেন যৌথভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর, আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস এইচ তিলাগর এবং অধ্যক্ষা সারদা দীক্ষিত। অধ্যাপক নস্কর বলেন, এই ধরনায় মাত্র ২০০ জনকে জমায়েত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যন্তর মন্তরের এই জায়গায় দু'দিক দিয়ে পুলিশ গার্ডরেল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। চতুর্দিকে প্রহরা। অথচ শিক্ষানীতি গ্রহণ করার সময় শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট কারও মতামত নেওয়ার কোনও চেষ্টা করেনি সরকার। এমনই নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র আজ চলছে এই দেশে। ভারত একটা পুলিশ রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

শুরুতেই কমিটির সর্বভারতীয় সম্পাদক অধ্যাপক অনীশ রায় এই শিক্ষানীতির নানা বিপজ্জনক দিক উল্লেখ করে একে প্রতিহত করার আহ্বান জানান। তিনি কিসান আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে আন্দোলনকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন। জেএনইউ-র স্কুল অফ সোসাল সায়েন্সের অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সিনহা বলেন, এই শিক্ষানীতি অভিজাত এবং ধনীদের স্বার্থে। এই শিক্ষানীতি চালু হলে শহর-গ্রামের দরিদ্র মানুষ শিক্ষার সুযোগ হারাবে। তিনি প্রশ্ন করেন, যে শিক্ষা সরকার দেবে বলছে, তা কি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক হবে? এর বিপরীতে সরকার ধর্মভিত্তিক মধ্যযুগীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকার কর্মী জন দয়াল বলেন, এই শিক্ষানীতিতে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে তা দেশের ফেডারেল চিন্তার বিরোধী। শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা উল্লেখ করে বলেন, ভারতবাসী যাতে গোটা বিশ্ব থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্বনাগরিক হতে পারে তার জন্য তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হয় আধুনিক শিক্ষা অথবা ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে অন্ধতা— এ দুটোকে মেশানো যায় না। আমাদের ভাবতে হবে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা মানুষ তৈরি করতে চাই, নাকি হিন্দুত্ববাদী নাগরিক চাই? কর্নাটকের একটি কলেজের অধ্যক্ষ আলামপ্রভু বেত্রাদুরু শিক্ষার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে বলেন। শিক্ষার বেসরকারিকরণের উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটা বেসরকারি স্কুল খুললেই কোটিপতি হওয়া যায়।

মণিপুরের শিক্ষাবিদ প্রেম সিংয়ের মতে, এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর চেষ্টা করছে সরকার। সংস্কৃত জোর করে চাপানোর চেষ্টা করছে। মণিপুরের ছাত্রসমাজ এর বিরুদ্ধে। সরকার মতামত নেওয়ার নামে কীভাবে শিক্ষানুরাগী মহলের সাথে প্রতারণা করেছে তা তুলে ধরে শিক্ষাবিদ ডঃ মাইকেল উইলিয়ামস বলেন, মাত্র ৩০-৫০ দিন সময় দিয়েছে মতামত দেওয়ার জন্য। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা ৬৩ ও ৬৬ পাতার দুটি ভিন্ন দলিল প্রকাশ করেছে। এই শিক্ষানীতি বানাতে যেভাবে বিদেশি নানা দলিলের কপি-পেস্ট করা হয়েছে তা লেখা চুরির তুল্য। তাঁর মতে এই শিক্ষানীতি চালু হলে গ্রাম-শহরের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক শিক্ষা নিতে পারবে না। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিতেন্দ্র মিনার কথায়, প্রধানমন্ত্রী দেশ বেচে দিচ্ছেন, শিক্ষাকেও। এই নীতি শিক্ষার স্বাধিকার ধ্বংস করছে। শিক্ষায় গুজরাট মডেলের স্বরূপ তুলে ধরে সে রাজ্যের শিক্ষাবিদ কালু ভাই খারোদিয়া বলেন, শিক্ষানীতি যেমন কপি করে চালানো হচ্ছে, তেমনই গুজরাটের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কপি করে চালানো হচ্ছে। গুজরাটে যে কোনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার ফলে একজন স্কুল শিক্ষককে একই সাথে ৫টি ক্লাস সামলাতে হয়।

বেসরকারিকরণের ফলে শিক্ষা কীভাবে ব্যয়বহুল হওয়ায় সার্বজনীন শিক্ষা ব্যাহত হবে, তা তুলে ধরেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এই শিক্ষানীতি বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাকে ব্যাহত করবে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবে। শিক্ষার স্বাধিকার ধ্বংস করার উদাহরণ হিসাবে জেএনইউ ও বিশ্বভারতীতে কেন্দ্রীয় সরকার যা করছে সেগুলি তুলে ধরে তিনি বলেন, বোঝা যায় এরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেমন করে চালাবে! শিক্ষাকে কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের হাতে বেচে দেওয়ার জন্যই অর্ধেকের বেশি বাজেট ছাঁটাই করা হয়েছে। কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবাশিস রায় তাঁর ভাষণে সারা দেশে সেভ এডুকেশন আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান।

রান্নার গ্যাসের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ

অনন্তপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ

কল্যাণী, নদিয়া

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com